তারিখ ... NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য

মানবসম্পদ | মো. এনামুল হক খান

প্রকৌশলী, কলাম লেখক

মেধাবী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে যোগ্য শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি আশা করা যায় না। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য দরকার অব্যাহত প্রশিক্ষণ। তাদের থাকতে হবে কম্পিউটার, চিত্রাঙ্কন ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ভালো জ্ঞান। তথ্যে সমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চায় থাকতে হবে প্রতি বিদ্যালয়ে দৈনিক পত্রিকা, থাকবে লাইব্রেরি। যার অভাব দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। শতভাগ মানসম্মত শিক্ষা তখনই নিশ্চিত করা সম্ভব, যখন শিক্ষক হবেন যোগ্য

দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে, অনেক পরিবর্তন এসেছে সমাজ-সভ্যতায়। উর্বর ভূমিতে ফসল উৎপাদনও বেড়েছে। এখন আর অর্ধাহার-অনাহারে মানুষের মৃত্যুর খবর তেমন পাওয়া যায় না। অভাব-অনটন আগের মতো নেই। বন্যা-খরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে। কলেরা-বসন্ত মহামারী আকারে আগের মতো আঘাত হানে না। আগের মতো ছনের ঘর আর দেখা মেলে না। এই পরিবর্তন এসেছে মানুষের শিক্ষার কারণে। শিক্ষার ফলে মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। আজ ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুলে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এমনটা ছিল না। আমাদের এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ জমিদার-রাজা-বাদশাদের গড়া। তখন নারীদের অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত। আর পুরুষদের শিক্ষার হার ছিল অর্ধেকের অনেক কম। আজ শিক্ষা গ্রহণে সন্তানরা এগিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে কারিগরি-প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সেই শিক্ষা হবে 'সুশিক্ষা, মানুষের মতো মানুষ হওয়ার শিক্ষা।' গ্রহণ করতে হবে বাস্তবধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি, যা হবে সুশিক্ষা ও সন্তোষজনক শিক্ষা। আর করতে হবে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, দরকার পুরনো নড়বড়ে বিদ্যালয় ভেঙে নতুন করে গড়া এবং মেরামত করা। দরকার শিক্ষার পরিবেশ ঠিক রাখা।

এ কথা ঠিক যে, আমাদের সন্তানরা অলস অথর্ব নয়, হাবাগোবা নয়, তাদের মস্তিষ্ক উর্বর, তারা বুদ্ধিমান-মেধাবী। সঠিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলে তারা সহজে বুঝে নেয়। তাই তাদের নিয়ে সঠিক পরিকল্পনায় এগোতে হবে। সেই পরিকল্পনা হবে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা। তবেই তারা আরও উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে, ইতিহাস-অর্থনীতি শিখবে। তারা পারে না, বুঝে না এমন কিছু নেই। তাদের প্রতি অনেকে না বুঝে ভিন্ন মন্তব্য করেন– অনেকটা বেগুনের নাম রাখার মতো। যেমন– গুণ বেশি হলেও আমরা তাকে ডাকি বেগুন। মনে রাখা দরকার, মেধাবী শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে যোগ্য শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি আশা করা যায় না। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য দরকার অব্যাহত প্রশিক্ষণ। তাদের থাকতে হবে কম্পিউটার, চিত্রাঙ্কন ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ভালো জ্ঞান। তথ্যে সমৃদ্ধ জ্ঞানচর্চায় থাকতে হবে প্রতি বিদ্যালয়ে দৈনিক পত্রিকা, থাকবে লাইব্রেরি। যার অভাব দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। শতভাগ মানসম্মত শিক্ষা তখনই নিশ্চিত করা সম্ভব, যখন শিক্ষক হবেন যোগ্য। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতের শাসন, ডাস্টারের আঘাত, কানমলা দেওয়া বন্ধ করতে হবে– স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যে করতে হবে মুখের কথায় শাসন।

২০১৭ সালে এসএসসি, এইচএসসিতে কয়েকটি শিক্ষা বোর্ডের ফল বিপর্যয় সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই ভাবনাকে ফলপ্রসূ করতে নিতে হবে নানামুখী পদক্ষেপ, শিক্ষার ভিত রচনায় প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি জোর দেওয়া জরুরি, সমান তালে চলবে মাধ্যমিক শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ঘোচানো হবে অন্যতম পথ। প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে শিক্ষার্থীদের আনন্দময় স্থান, ভয়ের নয়। শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মনের আনন্দে যাবে, শিক্ষকের কথা শুনবে, দৌড়াবে, খেলবে। তাদের জন্য ফ্রি শিক্ষার পাশাপাশি টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক তাদের আদর-স্নেহে কাছে টানবেন, উৎসাহ দেবেন; যা এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে, নতুন বিষয় শিখতে আগ্রহী করে তুলবে।

সন্তানের শিক্ষার প্রতি পিতা-মাতাকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পড়ার টেবিলে পড়ে কি-না, থাকতে হবে সেই নজরদারি। খেলাধুলার পাশাপাশি পড়ার প্রতি মনোযোগী করতে হবে। শিক্ষা ছাড়া বিকল্প নেই এই চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই সন্তান পড়ার প্রতি মনোযোগী হবে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলবে। তাতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন তাদের দ্বারা সম্ভব হবে। সন্তান যোগ্য হয়ে গড়ে উঠলেই রাজনীতি-অর্থনীতির অঙ্গন, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীসহ সব কর্মক্ষেত্রে থাকবে তাদের সমান পদচারণা। সব মা-বাবা সন্তানের দিকে চেয়ে ভাবেন, আমার সন্তান লেখাপড়া শেষ করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে, সংসারের অভাব-অনটন ঘোচাবে। এই সন্তানকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে প্রথম দায়িত্ব অবশ্যই বাবা-মায়ের। বই-খাতা-কলম কি প্রয়োজন তা জানতে হবে, কোনো বিষয়ে শিক্ষকের কাছে পড়া প্রয়োজন কি-না খেয়াল রাখতে হবে। শুধু চাকরি-ব্যবসা-কৃষি কাজে নজর রাখলে চলবে না। সন্তানের পড়াশোনার সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকের সহযোগিতা নেওয়ার দরকার হলে তাও নিশ্চিত করতে হবে। সংসার মা-বাবা উভয়ের, সন্তানের পড়াশোনাসহ সব বিষয়ে উভয়কেই পরামর্শ করে এগোতে হবে। সন্তান পড়ার সময় পড়ে কি-না, খেলার সময় খেলে কি-না, থাকতে হবে এই নজরদারি। শুধু ধমকালে চলবে না, আদর-সোহাগের সঙ্গে থাকবে মৃদু শাসন। চা দোকানে বসে সময় নষ্ট করতে না দেওয়া, বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে না দেওয়া, সবই পরিবারের নজরদারির কাজ।

শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে, প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করা শিক্ষার্থীদের অন্যতম কাজ। এ কাজে ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেকে নিজে ফাঁকি দেওয়া। আর শিক্ষকরা হলেন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, এলাকার মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করেন, ছাত্রদের আদর্শের মানুষ। এই শিক্ষকদের কাজ শিক্ষার্থী পড়ার বিষয়টি বুঝল কি-না নিশ্চিত করা, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার্থীদের জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকরা কাজ করবেন। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা, নিয়মিত সাবান দিয়ে গোসল করা, যথাসময়ে খাওয়া, নিজের কাজ নিজে করা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ধারণা দিতে হবে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থা জ্ঞাত করানো শিক্ষকদের কাজ। স্কুলে বিলম্বে আসাসহ শিক্ষার্থীদের কোনো গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে অভিভাবকদের জানানো শিক্ষকদের কাজ। সেই সঙ্গে শিক্ষকসহ দায়িত্বশীল সবাইকে শ্রেণিকক্ষে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে খেয়াল রাখতে হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁছাড়া বিদ্যালয়কে পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা অবশ্যই জরুরি। নিতে হবে অভিভাবকদের সচেতন করার কার্যক্রম। প্রয়োজনে পত্রপত্রিকা ও প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে অভিভাবক প্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দায়িত্বও অনেক। খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থার দিকে। খেলার মাঠগুলোকে রক্ষা করে বালু ভরাটের মাধ্যমে উঁচু করে সারা বছর যাতে খেলার উপযোগী থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ফুটবল, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্দা, সাঁতার, কানামাছি, ভলিবল, ক্রিকেটসহ রাখতে হবে সব খেলার ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি। জাতীয় সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, নাটক মঞ্চায়ন ইত্যাদির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। নিজ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার কোনো বিকল্প নেই। সন্তানকে ফুল বাগান করার উৎসাহ দিতে হবে, এতে করে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। সার্বিক তদারকির সুফল হিসেবে সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তাদের মনে নীতি-নৈতিকতা বোধ জাগবে, তাদের মানুষিক বিকাশ হবে, দেশের প্রতি মমত্ববোধ বাড়বে; তবেই তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়া দরকার।